মেঠো পথে বিজয়ের নিশান

ইরানী বিশ্বাস

পঁচাত্তর পরবর্তীতে বাংলাদেশের সবচেয়ে অবহেলিত জেলার নাম ছিল গোপালগঞ্জ। সারাদেশে উন্নয়ন হলেও গোপালগঞ্জে ছিল না কোনো উন্নয়নের ছোঁয়া। ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার গঠন করার পর সব অবহেলা পেছনে ফেলে জেলার উন্নয়নে প্রকল্প পাস করা শুরু হয়। গ্রামে খাল কাটা প্রকল্প চালু হয়। হতদরিদ্র মানুষের কাজের একটা গতি হয়। খাল কেটে মাটি ফেলে রাস্তা তৈরি করা হয়। নিচু এলাকা বলে একবারেই বড় রাস্তা তৈরি করা সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রত্যেক বছর বর্ষায় ডুবে গিয়ে মাটি ধুয়ে যাবে। তাই মাঝারি রাস্তা করে প্রাথমিক কিছু ইট বিছিয়ে দেওয়া হয়। যাতে রাস্তার মাটি পাকা রাস্তা তৈরির উপযুক্ত হয়। কিছু লোহার পুল তৈরি করা হয়। বিদ্যুৎ লাইন দেওয়ার জন্য খুঁটি স্থাপন করা হয়। ধারনা ছিল আগামী শুকনা মৌসুমে আবার মাটি কেটে রাস্তা মজবুত করে পাকা করা হবে। তারপর বিদ্যুৎ আনা হবে।

২০০১ সালে ক্ষমতায় দলবদল হয়। এই জেলার উন্নয়ন আবার পেছনে হাঁটতে শুরু করে। কে বা কারা রাতের আঁধারে বিদ্যুতের খুঁটি তুলে নিয়ে গেল। রাস্তার মাটি থেকে ইট তুলে নিয়ে যাওয়া হলো। গ্রাম আবার আগের মতো হয়ে গেল। ২০০৮ সালে আবার ক্ষমতায় আসে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল। গ্রামের মানুষের মনে স্বস্তি ফিরে আসে। শুরু হয় অবহেলিত সেই জেলার উন্নয়ন প্রকল্প। যার ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত।

আমার মেয়ের কাছে প্রায়ই আমার ছোটবেলার সেই গ্রামের গল্প করি। সে মনে মনে ছবি আঁকে গ্রামের মেঠো পথ, নৌকায় করে বিলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া। যেতে যেতে দুপাশে লাল-সাদা শাপলা আর কচুরি ফুলের সমারোহ। হয়তো এসব দৃশ্য ওকে খুব টানে। ব্যক্তিগত কারণবশত আমার গ্রামে যাওয়া হয়নি অনেক বছর। ২০১৫ সালে আমার মেয়ে গ্রামে যাবে। তার বায়না সে বাস থেকে নেমে নৌকায় করে আমাদের বাড়িতে যাবে। কারণ আমার ছোটবেলায় বর্ষায় এটাই ছিল একমাত্র পথ। আর শুকনা মৌসুমে পায়ে হেঁটে অথবা নৌকায় করে যেতে হতো ৩ ঘণ্টা সময় নিয়ে। যে রাস্তা এখন ১০ মিনিটে যাওয়া যায়। যাই হোক, মা'কে জানানো হলো তাঁর নাতনীর ইচ্ছার কথা। তিনি জানালেন এখন তো বাড়ি পর্যন্ত টেম্পু অথবা অটোতে আসা যায়। তারপরও নাতনীর ইচ্ছার কাছে হার মানলেন আমার মা। কোনমতে একটা নৌকার ব্যবস্থা করা হলো, তবে সেই ছইওয়ালা নৌকা না পাওয়া গেলেও খোলা নৌকার ব্যবস্থা করা হলো।

এবছর দুর্গাপূজাতে বাড়ি গিয়েছিলাম। নিজের গ্রাম যেন আমি চিনতে পারছি না। প্রত্যেকটি নদীর উপর বিশাল দৈত্যের মতো ব্রিজ হয়েছে। যার উপর দিয়ে প্রাইভেট কার থেকে শুরু করে বড় বড় ট্রাক চলে যাচ্ছে। গ্রামের অধিকাংশ ঘর সিমেন্টে বাঁধানো। সুন্দর দোতলা, একতলা বাড়ি, কেউ কেউ ডুপ্লেক্সও করেছে। ঘরে ঘরে ইলেক্ট্রিসিটি। সুপেয় পানির জন্য ডিপ টিউবয়েল। গ্রামে এখন আর খড়-বাঁশের ঘর নেই। আগের মতো বর্ষা হয় না। তাই বিলে জল নেই। নেই শাপলা বা কচুরিপানার ফুল। অটো ভাড়া করে বাড়িতে যেতে হলো। যেতে যেতে মনে হলো, আমার দেখা সেই দৈন্যদশার গ্রাম এখন কতো সমৃদ্ধশালী। মানুষের স্বাস্থ্য দেখলে বোঝা যায় তাদের এখন আর খাবারের কষ্ট নেই। গোলাভরা ধান, প্রত্যেকের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ। টিভি-ফ্রিজ-মোবাইল, ইলেক্ট্রিক শ্যালো মেশিন, কি নেই এদের হাতের নাগালে।

আমাদের বাড়িতে শহুরে সকল আয়োজন আছে। শুধু ব্যতিক্রম আমাদের বাগান আর মাটির উঠোন। এলপি গ্যাসে রান্না, মোটরে জল তুলে বাথরুমে স্নান করা। এখন আর কেউ পুকুর বা খালে স্নানের জন্য যায় না। আগে দল বেঁধে নদীতে স্নান করার দৃশ্য ছিল অপূর্ব। যে মানুষটাকে দেখেছি আমাদের বাড়িতে বছরের বহতা কাজ করতে তার সিমেন্টের বাঁধানো ঘরে টিভি চলছে। আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো, বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আমেরিকা কি ভাবছে? আমি তাকিয়ে আছি তার মুখের দিকে। এসব মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের খবর রাখে? আমার অবস্থা বুঝতেই তিনি বললেন, এখন তো নিয়মিত টিভি দেখি, মোবাইলে সংবাদ দেখি। রাতে মোবাইল ইন্টারনেটে বিবিসি সংবাদ শুনি। জার্মানির টকশো দেখি, সব সংবাদ জানতে পারি। আমি মিডিয়ার সঙ্গে জড়িত শুনে অনেকেই আমাকে বিশ্ব মিডিয়ার সংবাদ জিজ্ঞেস করে। বলিউডে নতুন কোন মুভি রিলিজ পেল। কোন গান সবচেয়ে হিট হলো। হলিউডে কোন তারকা কতো টাকা আয় করে, এসব তথ্য শুনে আমি রীতিমতো হতবাক বনে যাই। এই কি আমার সেই গ্রাম? যেখানে ঘরের মধ্যে এক গলা জলে দাঁড়িয়ে আমি সাঁতার কাঁটতে শিখেছি! যে গ্রামের মানুষ রিলিফের অভাবে অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটিয়েছে। শুধুমাত্র গোপালগঞ্জের নাম শুনলে প্রজেক্ট বাতিল হয়ে যেত। বছরের পর বছর খাল খনন না হওয়ার কারণে বন্যা হতো। বিদ্যুৎ না থাকার কারণে কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন বা কলকারখানার সৃষ্টি হয়নি। মিঠা জলের মাছের জন্য প্রসিদ্ধ হিসেবে বিখ্যাত এই অঞ্চলের মাছ আগে দ্রুত বিক্রি বা সংরক্ষণের ব্যাবস্থা ছিল না। ফলে মানুষ ছিল অভাবী, অনাহারী।

বর্তমানে এ অঞ্চলে ইরি চাষ হচ্ছে। উচ্চ ফলনশীল ইরি ধানে যেন জমি থৈ থৈ করছে। বাড়িতে বাড়িতে ধানের ছড়াছড়ি। বড় রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাজার বসেছে। সেখানে নিত্য বাজার বসে। মানুষ এখন আর সাপ্তাহিক হাটের জন্য অপেক্ষা করে না। নিম্নবিত্ত মানুষ ঘরের চালে বেয়ে ওঠা লাউ, কুমড়া নিয়ে চলে যায় বিক্রি করতে। কেউ বসে খায় না। এসব বাজারে বরফ কল স্থাপন হয়েছে, ফলে কারখানায় কাজের ব্যবস্থার পাশাপাশি দুর্বল বা মরা মাছ সহজে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিলের যে কোনো জায়গা থেকে মাছ ধরার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ট্রাক বা যানবাহনে করে ঢাকা বা নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এতে লাভবান হচ্ছে এলাকার মানুষ। কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক পরিবর্তন চোখে পড়ে। এ এলাকার কৃষক সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করে কৃষি সরঞ্জাম কিনতে পারছে যেমন ট্রাকটর, ধান কাটা মেশিন, ধান মাড়াই মেশিন এমনকি অটো রাইস মিল সহজে করতে পারছে। ঘরে বসে কৃষক বা গৃহিনী ভিডিও কলের মাধ্যমে থানা কৃষি অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারছে। এর মধ্যে রয়েছে সবজি চাষ প্রণালি, মাছ চাষ প্রণালি, ফল বা ঔষধী গাছ রোপণের প্রকৃত সময় বা রক্ষণাবেক্ষণ তথ্য।

এই এলাকার চেহারা পরিবর্তন হয়েছে গত ১০ বছরে। এরই মধ্যে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ পদ্মা সেতু। পদ্মা সেতু সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে এ এলাকার মানুষ ঢাকা থেকে বাড়ি ফিরছে মাত্র ৩ ঘণ্টায়। ঢাকা-খুলনা বাইপাস চার লেনের রাস্তা হচ্ছে। এটা সম্পন্ন হলে আমার বাড়ি যেতে সময় লাগবে মাত্র ২ ঘণ্টা। ফলে মানুষের রাজধানীমুখি হওয়া থেকে বিরত থাকবে বরং ঢাকায় বসবাসরত অনেক পরিবারই নিজ নিজ বাড়িতে ফেরত আসবে। তারা অনায়াসে বাড়ি থেকে ঢাকা অফিস করতে পারবে। এটা শুধু আমার জেলার উন্নয়নের জোয়ার নয়। এটা সমগ্র বাংলাদেশের উন্নয়নর।

সারা দেশের মানুষ স্বপ্ন দেখে, একদিন শীর্ষ উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় স্থান পাবে আমাদের সোনার বাংলা। প্রত্যন্ত অঞ্চলের সেই মেঠো পথে যখন একটি মেয়ে মোটরবাইক চালিয়ে স্কুল-কলেজে বা চাকরি করতে যায় তখন আমার গর্বে মন ভরে যায়। বিজয়ের নিশান উড়িয়ে আমি হেঁটে যাই আমার চেনা মেঠোপথ ধরে। দূরে তাকিয়ে দেখি বিরোধীদলের ইট তুলে নিয়ে যাওয়া রাস্তা এখন পিচঢালা হয়েছে। তাতে দানবের মতো চলছে ইঞ্জিনচালিত যানবাহন। মনে মনে বলি, আমার সেই মেঠোপথের গ্রামে মুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। বিজয়ের আনন্দফসল মিশে আছে বাংলার অবারিত প্রান্তরজুড়ে। দিগন্তজুড়ে সবুজ ধান ক্ষেতের মায়া যেন ডাকছে আমাকে, ফিরে এসো মেয়ে শহর ছেড়ে চিরচেনা গ্রামে। মায়ের মমতা বিছানো পথে, হেঁটে যাও আলতো পায়ে।